Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501097 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Sankari Prasad Basu's Thoughts on Chandidas
শঙ্করীপ্রসাদ বসুর চণ্ডীদাস ভাবনা

Suchitra Karar
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati, Santiniketan

Received on: 18th June 2026
Accepted on: 28th June 2026

Abstract:
In the discourse on medieval Bengali literature, Chandidas remains a figure of enduring wonder and the focal point of debate. The analysis of Chandidas's poetic persona and philosophy of poetry by the renowned researcher and literary critic Professor Sankari Prasad Basu constitutes an indispensable chapter in Bengali literary criticism. In his analysis, Chandidas is not merely a composer of 'pada' (lyric verses); he is a dedicated devotee of poetry — a 'kavitapas' — who, as a 'poet of Radha,' has illuminated the full spectrum of Radha's emotional experiences. Sankari Prasad Basu has added a new dimension to scholarly efforts by exploring Chandidas's spiritual profundity, the philosophy of sorrow and silence in his poetry, and by untangling the complexities of the 'Chandidas problem.' The present discussion attempts to examine the poetry and spiritual quest of Chandidas through a research-oriented lens, drawing upon the perspectives of Sankari Prasad Basu.

Key Words:
kavitapas, Chandidas problem, religious philosophy of Chandidas, Sahajiya spiritual practice, Chandidas versus Vidyapati

মূল প্রবন্ধ

১

মধ্যযুগীয় ধারায় পদাবলি সাহিত্যের স্থান অনস্বীকার্য। কারণ সেই রসের অমৃতধারা আজও মানুষকে সমভাবে আনন্দিত করে। এই বিশাল সাহিত্যসম্ভারের কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন পদাবলির চণ্ডীদাস। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, "... মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান কবি ব্যক্তিত্ব। বাঙালীর ভাব-সাধনার... আদি কবিগুরুর নাম চণ্ডীদাস।"[১] তাঁর কাব্য বাঙালির ভাব-সাধনায় ভিত্তি স্থাপন করেছে। চণ্ডীদাস কেবল কবি নন, তিনি বাঙালির আবেগের প্রতীক। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সংশয়াচ্ছন্ন। সেই চণ্ডীদাসকে নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অজস্র সমাধানহীন প্রশ্ন বিদ্যমান: তিনি কে, কয়জন, কোথায় বা কবে তাঁর জন্ম। চণ্ডীদাস কি একজন ব্যক্তি নাকি

© Santiniketan Sahityapath

একাধিক কবির ভণিতা? প্রশ্নটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামে পরিচিত। তাই চণ্ডীদাস গবেষকদের কাছে একটি দীর্ঘস্থায়ী ধাঁধার নাম। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর প্রশ্ন — 'চণ্ডীদাস কয়জন?' ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথি আবিষ্কারের পর এই সমস্যাটি আরো ঘনীভূত হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় মনে করেন, বড়ু চণ্ডীদাসই আদি চণ্ডীদাস এবং তাঁর কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই বিতর্কের মধ্যে চণ্ডীদাসের একটি স্বকীয় সত্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে কবিদের মধ্যে অন্তত দুইজনের নাম সুনিশ্চিত — চৈতন্য-পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। তাঁর বিবেচনায় পদাবলির চণ্ডীদাস একক অস্তিত্বহীন; অল্প 'বড়ু'র, বেশি 'দীনের' এবং কিছু অন্যের পদ-মৃত্তিকায় গঠিত এক "নূতন কবি 'তিলোত্তমা' "[২] অর্থাৎ চণ্ডীদাস সংশ্লেষিত কবি-ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপক বসুর মতে, চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব না চৈতন্যোত্তর — এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো চণ্ডীদাসের ভাবসাধনার প্রকৃতি। কারণ চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের চেতনার যত কাছে অবস্থান করেন, চৈতন্য-তত্ত্বের থেকে ততখানি দূরে তাঁর অবস্থান। অর্থাৎ, চণ্ডীদাসের পদে রাধাকৃষ্ণ বর্ণিত প্রেম কেবল বৈষ্ণব শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত নয়, তার মধ্যে গভীরতম অনুভূতি ও লৌকিক আকুতি আছে। তাই, চণ্ডীদাস হয়তো কালানুক্রমিকভাবে বা ভাবগতভাবে চৈতন্যের কাছাকাছি ছিলেন। কারণ বাঙালির বৈষ্ণব-ভাবনা চৈতন্য ও চণ্ডীদাসের যৌথ সৃষ্টি — এই ধারণাকে সমর্থন করে। তবে তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং কাব্যিক ভাবপ্রবণতা চৈতন্য-আন্দোলনের পরবর্তী প্রথাগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শের অনুসারী ছিল না। চণ্ডীদাসের চৈতন্য চেতনা নিকট এবং দূরত্বের ঐতিহাসিক সংশয় পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে মর্ত্যপ্রেমের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলির চণ্ডীদাসের মধ্যে একাধিক পার্থক্য দেখিয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে কোথাও 'দ্বিজ' বা 'দীন' ভণিতা ব্যবহার করেন নি এবং তাঁর রাধা পদাবলির রাধার মতো আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত নয়। তিনি মনে করেন, কিছু সংস্করণে অনেক 'অকাব্য' চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে যা প্রকৃত চণ্ডীদাসের রচনা নাও হতে পারে। তাঁর মতে, চণ্ডীদাসের বহু পদে অনুভূতির একরূপতা বা বৈচিত্র্যহীনতা থাকলেও সেখানে একটি বিশেষ 'কবিস্পর্শ' থাকে যা অকাব্যের মধ্যে থাকে না। তাই ঐতিহাসিকভাবে চণ্ডীদাস যেই হোন না কেন, বাঙালির হৃদয়ে চণ্ডীদাস বলতে যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, তার কাব্যমূল্য অপরিসীম।

Prantik Gabeshana Patrika

২

চণ্ডীদাসের কাব্যালোচনায় তাঁর জীবন-কাহিনি অপরিহার্য, যদিও সেই কাহিনি প্রামাণ্য নয়। তবে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বিশ্বাস, এই জীবনকাহিনির সঙ্গে চণ্ডীদাস-সত্যের মূল সূত্রটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জীবনকথা সন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ কবির ব্যক্তিজীবন ও ভাবজীবন স্বরূপে একাকার হয় অর্থাৎ কবির বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তিই কাব্যরূপে উপস্থিত হয়। তাঁর মতে, চণ্ডীদাস-রামীর জীবন-কাহিনি হলো চণ্ডীদাসের 'প্রেম-বেদের পুরাণ-কাহিনী'। চণ্ডীদাস-রামী লীলাই হলো রাধাকৃষ্ণ-লীলার গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকা। তবে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর প্রশ্ন — নিজের ভাবজীবনের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ করে কি কবি নিজ ব্যক্তিজীবন গঠন করেছিলেন, নাকি কৃতজ্ঞ বাঙালিরাই একটি আদর্শ প্রেমমূর্তি রচনা করে কবিকে উপহার দিয়েছে? অর্থাৎ, এটি কি বাঙালির 'কবি'-কল্পনা? এই জীবন-কাহিনির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় চৈতন্য-সমকালীন নরহরির উক্তি (তারা ধ্রুবনী রামতারার অপভ্রংশ) থেকে, যদিও রামীর রচিত পদগুলি কত পুরাতন, তা বলা কঠিন। চণ্ডীদাস বাসুলী-মন্দিরে সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে রজকিনী রামীকে প্রথম দেখেন। বাসুলী দেবীর কাছে তিনি যখন নিজের দ্বিধার কথা জানান, তখন দেবীর আদেশ ছিল, চণ্ডীদাস "ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস।"[৩] কারণ রামী তাঁকে সেই পবিত্রতা দেবেন যা ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা বাসুলী নিজেও দিতে পারবেন না। ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা যাই হোক না কেন, চণ্ডীদাস-রামী কাহিনি চণ্ডীদাসের কাব্যের রস আস্বাদনে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তাই বীরভূমের নানুরের বাসুলী দেবীর সেবক চণ্ডীদাস কেন একজন রজকিনীকে নিজের প্রেম ও সাধনার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন, তার পেছনে কাজ করেছে এক গভীর 'সহজ-তত্ত্ব'। আসলে চণ্ডীদাসের ধর্মবোধে মর্ত্য ও মানবপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল। তাঁর বিখ্যাত উক্তি — "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"[৪] বস্তুত চণ্ডীদাসের জীবনদর্শন। চণ্ডীদাস তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাকে কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তর করেছেন। রামতারক

© Santiniketan Sahityapath

ন্যায়রত্নের মতো তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত করলেও, চণ্ডীদাস তাঁর 'সহজ সাধনা' থেকে বিচ্যুত হন নি। দেবীর আদেশ সত্ত্বেও সমাজের কাছে চণ্ডীদাস পতিত হন। রজকিনীর কলঙ্কহেতু সমাজচ্যুত চণ্ডীদাসকে যখন জ্ঞাতিরা জাতিতে তুলতে চাইলেন, তখন রামী সেই আয়োজনে তীব্রভাবে আহত হয়ে অভিমান প্রকাশ করেন, 'নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল মনে বোধ দিতে নারে।' এবং 'গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পড়িয়া, শয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়।'"[৫] কবির জীবনের শেষ অধ্যায়ের ট্র্যাজেডি আরো গভীর। রামীর রচিত গীতিকা অনুযায়ী, চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গেয়ে বেগমকে মুগ্ধ করেন। চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হওয়ার কথা বেগম নবাবের কাছে নির্ভীকভাবে স্বীকার করায় নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। রামী এবং বেগম উভয়েই কবির এই শোচনীয় পরিণতি দেখেন। গীতিকা থেকে আরো জানা যায়, চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তাই ছিল রামীর শোকের অন্যতম কারণ। এই জীবনকথাকে 'প্রেম-বেদের পুরাণ-কাহিনী' হিসেবে দেখার কারণ হলো, চণ্ডীদাসের এই সমাজচ্যুত, অবৈধ পরকীয়া প্রেম ও চরম ট্র্যাজেডিই তাঁর 'অন্তর্জ্বালা' এবং 'কুলজ্বালা'র জন্ম দিয়েছে যা তাঁর কাব্যের মূলসুর হিসেবে প্রতিফলিত। চণ্ডীদাসের কাব্যের গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্যের মূল উৎস তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা যা রাধাকৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর জীবনজ্বালা ও রাধার জীবনজ্বালা একই ছিল। চণ্ডীদাস পুরুষদেহ ধারণ করলেও তিনি কৃষ্ণ নন। তিনি রজকিনী সংশ্রবে সমাজ-পতিত এবং তাঁর অবৈধ প্রেমে সমাজের সমর্থন ছিল না। তাঁকেও রাধার মতোই সামাজিক আঘাত পেতে হয়েছিল। তাই তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে আত্মবিভক্ত হয়েছিলেন। পুরুষ-প্রাধান্যের কারণে পুরুষের ব্যক্তিগত অশ্রুজল কাব্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বতঃই নারীকে অবলম্বন করেছে। এর ফলে রাধার অনেক দুঃখকথা চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত কথা বা তাঁর নিজের প্রাণযন্ত্রণার সৃষ্টি রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

৩

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অভিমত, চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম কেবল প্রাণময় বা সত্তাময় নয়, তা রক্ত, মাংস ও অস্থিময় এক বাস্তব অনুভূতি। যেখানে প্রেমকে কেবল গতানুগতিক ধর্মীয় প্রেম বললে তার অবমাননা করা হয় আসলে তা চরম অর্থে আধ্যাত্মিক। চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রেমের যে বিকাশক্রম দেখা যায় — পূর্বরাগে সত্তার জাগরণ ও প্রথম প্রেমের ব্যাকুলতা যা শুধুমাত্র লৌকিক আকর্ষণ নয়, এক ঐশ্বরিক আহ্বানের সূচনা করে। রূপানুরাগে প্রিয়তমের রূপের মধ্যে জাগতিক সৌন্দর্যের সন্ধান। আক্ষেপানুরাগে বেদনার অগ্নিতে আত্মশোধনের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধিকরণ হয়েছে। মিলনে মিলনের মুহূর্তকে এক ক্ষণিক আধ্যাত্মিক আলোকচ্ছটা হিসেবে দেখা। রসোদ্গারে মিলনের স্মৃতি রোমন্থন, মাথুর বিরহ, বিরহের অন্ধকারের মাধ্যমে পরম সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রয়াস। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট, চণ্ডীদাসের পদে বিরহ কেবল বিচ্ছেদ নয়, তা মিলনেরই এক উচ্চতর স্তর যা মরমিয়া সাধনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ পূর্বরাগে সত্তার জাগরণ থেকে শুরু করে রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মিলন, মাথুর এবং পরিশেষে ভাবোল্লাসের নিত্যবৃন্দাবন — তা আধ্যাত্মিক সাধনার সিঁড়ি। এই চরম আধ্যাত্মিকতা নিশ্চিত হয় আত্মবিসর্জনের রূপকের মাধ্যমে। এই প্রেমে নিত্য 'সতীদাহ' যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘটে যা প্রেমের জন্য জাগতিক অস্তিত্বের পূর্ণ বিলোপের প্রতীক। এবং "চূর্ণ পঞ্জরাস্থির উপরে প্রেমনিশান ওঠে"[৬] এই রূপকটি প্রমাণ করে যে, প্রেমসাধনা জাগতিক সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, এই সাধনা শারীরিক কাঠামোকেও অতিক্রম করে, আত্মবলিদানের মাধ্যমে দিব্য প্রেমের বিজয় ঘোষণা করে। তিনি নিঃসংশয়ে বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসকেই 'মিস্টিক' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং তিনি চণ্ডীদাসের প্রেমকে কঠোর দেহ-সাধনা ও ত্যাগের ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে, চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে বাঙালির যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ও প্রণতি, তার উৎস ছন্দের কারুকার্যে নয়, তা ভাবরসে নিহিত। তাঁর কাব্যের ভাবরস পান করার সময় পাঠক যে কাব্যরসের আস্বাদ পান, তা বাঙালি সংস্কৃতির এক বিশেষ সম্পদ। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে চণ্ডীদাসকে নিছক একজন ভক্তিমূলক ভাবুক হিসাবে না দেখে, তাঁকে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিচার চণ্ডীদাসের কাব্যকে লৌকিক প্রেমের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে শিল্পের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে। তাঁর মতে, চণ্ডীদাস যখন ভাব ও রূপের কথা বলেন, তখন তা এক গভীর আত্মসমর্পণের স্তর স্পর্শ করে। এই আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় নিজের সমগ্র চেতনার রূপান্তর ঘটে এবং তিনি 'দিব্যসঙ্গীত' শুনতে পান। ফলস্বরূপ, চণ্ডীদাসের সৃষ্টিকর্ম নিত্য চেতনার সুররূপে চূড়ান্ত সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয় যা নিশ্চিত করে তাঁর কাব্য কেবল ভক্তিমূলক আবেগ নয় তা মিস্টিক উপলব্ধির শিল্পরূপ।

© Santiniketan Sahityapath

শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে 'কবিতাপস' বা আধ্যাত্মিক সাধক কবি বলেছেন। তাঁর ধর্মদর্শন বৈষ্ণব তত্ত্বের আড়ালে ঢাকা পড়লেও তিনি তাঁর 'সহজ-তত্ত্ব'কে আলোকিত করেছেন। চণ্ডীদাসের কাছে প্রেমই ধর্ম, সেই প্রেমের পথটি সহজ-স্বাভাবিক। তিনি নিরাকার চেতনার সঙ্গে সাকার রূপের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর পদের 'শান্ত-শরণ' বা পদের শূন্যতাবোধ বৈষ্ণব কাব্যের চিরাচরিত আনন্দবাদের থেকে ভিন্ন যা তাঁকে আধুনিক গভীরতা দান করেছে। আবার শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে 'নৈঃশব্দ্যের মহাকবি' হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন, কারণ তাঁর শব্দরাশি প্রাণের গভীরতম ধ্বনিকে উন্মুক্ত করে এবং কোলাহলের পরিবর্তে অশ্রুময় চিরবিশ্রামের সন্ধান দেয়। রাধার জন্য ছিল "কূলে কূলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালো"[৭] যা অশ্রুযুক্ত চিরবিশ্রাম, যেখানে সখীরা পর্যন্ত নেই। চণ্ডীদাসের রাধা কোলাহলের উৎসবে বিশ্বাসী নয়, তিনি একাকী চেতনায় বিরাজমান। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁকে 'মৌনের মহান সঙ্গীতকার' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চণ্ডীদাসের মতো, "এত শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ।"[৮] এই নীরবতাই চণ্ডীদাসের কাব্যকে অন্যান্য পদকর্তাদের থেকে পৃথক করে তোলে। চণ্ডীদাসের পদে "করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা"[৯] বিরাজ করে। এই চিত্রকল্প তাঁর কাব্যের মহৎ ট্র্যাজেডি এবং চিরন্তন আশার সমন্বয়কে নিশ্চিত করে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, চণ্ডীদাস হলেন 'কবিতাপস' তাঁর পদের প্রতিটি ছত্রে এক 'অনাবরণ' এবং 'আত্মবান' সত্তার আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। এই উপাধিটি প্রমাণ করে, চণ্ডীদাস কেবল স্রষ্টা নন, তিনি তপস্বীর ন্যায় আত্মনিবেদন ও সাধনার মাধ্যমে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রেমকে "বেদনার কালীদহে সিত পদ্মের মতো"[১০] — এই উপমার দ্বারা গভীর ও পবিত্র বোঝানো হয়েছে। এই উপমা ইঙ্গিত দেয়, তীব্র দুঃখ ও বেদনার মধ্যে তাঁর কাব্যিক সৃষ্টি স্থিতিশীল ছিল। অধ্যাপক বসুর উল্লেখ, "এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে!"[১১] এই উক্তিটি তাঁর কাব্যের সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আত্মিক উন্মোচনের দিকে ইঙ্গিত করে। তাহলে 'চণ্ডীদাস কি আধ্যাত্মিক কবি?' এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, চণ্ডীদাসের মতো কবিরা আছেন বলেই আধ্যাত্মিকতা অনুভূত হতে পেরেছে। নীরব ও অকথনীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে ভাষা প্রদানের শক্তি চণ্ডীদাসকে সাধারণ ভক্ত কবির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। শ্রীচৈতন্যের জীবন যেমন আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রকাশ, চণ্ডীদাসের কাব্যও তেমনি সেই আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ দলিল। তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবন ও চণ্ডীদাসের কাব্যকে আধ্যাত্মিকতার এমন বৃহৎ সাক্ষ্যপ্রমাণ বলেছেন যে, "যাঁহারা অধ্যাত্মদর্শন লিখিবেন, দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহাদের বারবার ঐ প্রেমজীবন ও কবিজীবনের আঙিনাদ্বারে আসতে হবে।"[১২] এই বক্তব্য চণ্ডীদাসের সৃষ্টিকর্মকে কেবল সাহিত্য নয়, তা শাশ্বত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অপরিহার্য দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বা পরে যখনই চণ্ডীদাস আবির্ভূত হোন না কেন, তিনি চৈতন্যের যে 'অনামাঙ্কিত স্বরূপ-চিত্র' অঙ্কন করেছেন, তা অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচিত্র হিসেবে স্বীকৃত। অবশ্য চণ্ডীদাস তাঁর পদে কোথাও শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করেন নি। কারণ হলো চণ্ডীদাসের রাধাভাবের মধ্যেই চৈতন্যদেবের ভাবগাম্ভীর্য নিহিত আছে। এমনকি চৈতন্যতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসও এক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের কাছে ম্লান হয়ে যান। চণ্ডীদাসের আঁকা সেই চিত্র যেখানে "সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লুটায়"[১৩] বা মুরলীর সুরে গৌরাঙ্গের আগমন তাঁর দৃষ্টিতে এক অলৌকিক কাব্যসিদ্ধি। শুদ্ধ ভক্তির জন্য ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করতে হয়। চণ্ডীদাসও তাই করেছিলেন। চণ্ডীদাস দেখিয়েছেন, প্রেমের নদীতে ডুব দিলে মানুষ অমর হয় এবং সেখানে ডুব দেওয়াটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এই কারণে, শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সর্বকালের আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৪

শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে 'বাংলা কবি-ভাষার জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, চণ্ডীদাসই প্রথম কবি যিনি আটপৌরে এবং সহজ সরল গ্রাম্য ভাষাকে কাব্যিক উচ্চতা প্রদান করেছেন। চণ্ডীদাসের ভাষার অন্যতম প্রধান গুণ 'অনাবরণ' প্রকৃতি। বিদ্যাপতি যেখানে রাজসভার কবি হিসেবে অলঙ্কারের প্রাচুর্য ব্যবহার করেছেন, চণ্ডীদাস সেখানে শব্দের বন্ধন ছাড়িয়ে সরাসরি হৃদয়ের কথা বলেছেন। অধ্যাপক বসুর মতে, এই ভাষাসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে চণ্ডীদাস তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ভাষাকে এক আধুনিক ও আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছেন, চণ্ডীদাস ঠিক একইভাবে মধ্যযুগের ভাষাকে বাঙালির আবেগ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে তৈরি করেছিলেন। তাঁর পদে প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গ্রাম-বাংলার এক সজীব রূপ ফুটে ওঠে। চণ্ডীদাসের অলঙ্কারে রূপের অভাব থাকলেও সেখানে প্রাণের প্রকাশ অত্যন্ত প্রবল। তিনি চণ্ডীদাসের ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর বিখ্যাত পদগুলির উদ্ধৃতি

 © Santiniketan Sahityapath

ব্যবহার করেছেন। যেমন — 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম'; 'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি' এই পদের ভাষা এতটাই সরল যে তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল বাঙালির অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

৫

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আলোচনার অন্যতম দিক চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনাত্মক বিচার। এই দুই কবির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চণ্ডীদাসের কবিতা রুদ্রাক্ষমালা।"[১৪] বিদ্যাপতির পদ-কে যেখানে 'মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, চণ্ডীদাসের গান সেখানে 'সায়াহ্ন সমীরণের দীর্ঘ নিঃশ্বাস'। তাঁর মতে, বিদ্যাপতি আত্মবিহ্বল আর চণ্ডীদাস আত্মসমাহিত। বিদ্যাপতির কাব্য যদি হয় 'দেহ', তবে চণ্ডীদাসের কাব্য হলো 'প্রাণ'। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি হওয়ার কারণে তাঁর কাব্যে নাগরিক রুচি, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। পক্ষান্তরে, চণ্ডীদাস সহজ ভাষার এবং সহজ ভাবের কবি। তাঁর রাধার মধ্যে কৃষ্ণের প্রেম লাভ করার জন্য কোনো সূক্ষ্ম কৌশল নেই; অকৃত্রিম গভীর প্রেমই তাঁর একমাত্র সম্বল। তিনি দেখিয়েছেন, বিদ্যাপতির পদে বিরহ অনেকটা কাহিনিগত এবং মথুরা গমনের বর্ণনায় হাহাকার থাকলেও, চণ্ডীদাসের বিরহ অনেক বেশি অন্তর্মুখী। চণ্ডীদাসকে তিনি 'দুঃখের কবি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার রাধা প্রেমের চরম দুঃখেও এক অপূর্ব শান্তশ্রী ধারণ করে থাকে। তাই অধ্যাপক বসুর অভিমত, বিদ্যাপতির পদে সুখ-বঞ্চনার যে তীব্র আর্তনাদ পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসের পদে তা এক মহৎ শান্তিতে রূপান্তরিত হয়। চণ্ডীদাস প্রেমের ক্ষেত্রে উপভোগ এবং বিশুদ্ধতাকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পেরেছিলেন যার প্রমাণ তাঁর 'কামগন্ধহীন' প্রেম।

৬

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর চণ্ডীদাস-চর্চা পর্যালোচনার পর এটি স্পষ্ট হয় যে, চণ্ডীদাস কেবল প্রাচীন কবি নন, তিনি বাঙালির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর বিশ্লেষণের এক শক্তিশালী দিক হলো চণ্ডীদাসকে 'নৈঃশব্দ্যের মহাকবি' হিসেবে চিহ্নিত করা। বর্তমানের কোলাহলময় পৃথিবীতে চণ্ডীদাসের পদের এই গভীর নীরবতা ও আত্মসমাহিত ভাব এক মহৎ শান্তির বার্তা নিয়ে আসে। আমরা জানি চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান হয়তো কখনো সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হবে না, কারণ চণ্ডীদাস একটি বিশেষ কাব্যধারা বা ভাবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন যা কোনো একক ব্যক্তির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি দেখিয়েছেন বড়ু চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস যেই হোন না কেন, চণ্ডীদাসীয় পদের যে 'কবিস্পর্শ' এবং 'আবেগীয় গভীরতা' বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। তাঁর প্রেমের শুদ্ধতা আধুনিক মানুষের যন্ত্রনির্ভর জীবনে স্নিগ্ধতা দান করে। কাব্য আসলে জীবনব্যাপী সাধনা বা তপস্যা যা বারবার চণ্ডীদাস প্রমাণ করেছেন। চণ্ডীদাসের পদের যে মিস্টিক অনুভূতি, তা কেবল ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে এক সর্বজনীন মানবীয় আবেদনে উন্নীত হয়েছে। তাই অধ্যাপক বসুর বিশ্লেষণ অনুযায়ী চণ্ডীদাস চিরকাল 'কবিতাপস' হিসাবেই আমাদের সামনে উপস্থিত থাকবেন। তদুপরি আলোচক তাঁর লেখায় উল্লিখিত চণ্ডীদাস-রামী কাহিনিতে যে সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা বর্তমান সময়ের আধুনিক মূল্যবোধের সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ। কারণ চণ্ডীদাস তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গেয়েছেন। তাই শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে বন্দি করেন নি। তিনি চণ্ডীদাসের 'সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব'কে শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর পদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যকে উন্মোচন করেছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালির রুচি ও আবেগের যে রূপরেখা এঁকেছেন, তা বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে এক ধ্রুপদী নিদর্শন। চণ্ডীদাসের পদের শূন্যতা পাঠককে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। সাধারণত বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা বিরহের পর মিলনের প্রত্যাশা দেখি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার বিরহ যেন এক অনন্ত প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষাই চণ্ডীদাসকে আধ্যাত্মিকতার চরম সীমায় নিয়ে গেছে। তাই বলা যায়, চণ্ডীদাসের কবিগৌরব পর্যায়গুলির গতানুগতিক বর্ণনার উপর নয় তা রাধার প্রেম ও রোষের আপাত-বৈপরীত্যের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের গভীরতা প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর এই আলোচনাটি কেবল চণ্ডীদাসকে বুঝতে সাহায্য করে না, একইসঙ্গে তা বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলের সন্ধান দেয়। চণ্ডীদাসের কবিত্ব আজও বাঙালির প্রাণের আরাম ও মনের শান্তি।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যসূত্র:

১। ‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম দে’জ সংস্করণ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুআরি ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৫
২। ওই
৩। ওই, পৃ. ২৯
৪। ওই, পৃ. ৩৪
৫। ওই, পৃ. ২৯
৬। ওই, পৃ. ১০৬
৭। ওই
৮। ওই
৯। ওই
১০। ওই
১১। ওই,
১২। ওই, পৃ. ১০৫
১৩। ওই, পৃ. ১০৫
১৪। ‘বিবিধ প্রবন্ধ’, ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, অপার সারকুলার রোড, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ৫৬

—

© Santiniketan Sahityapath